International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-II, Issue-IV, January 2016, Page No. 19-26
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

ভারতবর্ষ এবং ছোট রাজ্যের প্রশ্ন: প্রাসঙ্গিকতার অনুসন্ধান

বিশ্বনাথ সরকার

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, শ্রীচৈতন্য কলেজ, হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

The Constitution of India describes India (i. e. Bharat) as a 'Union of States' not a federal union. However the system of government introduced by the Constitution is federal. The Indian model of federalism is unique in its own fetchers. In practice it is quite different from the classical models found in countries like the United States of America, Canada and Australia. One distinguishing feature is the unilateral power enjoyed by the Union Parliament to reorganize the political structure of the country by forming new states and to alter the areas, boundaries or names of the existing states. The increasing demand for new states within India raises a number of questions. After 1947 many smaller states were created but it is an on-going and endless process that remains unfinished. There are, of course, practical and emotional considerations like culture, religion, language and a sense of economic and regional deprivation. But dividing India and unitary system of India on such fragile factors can only lead to anarchy. There is no immediate solution for whole and part of India but it is a beginning of a new big problem. In this article, I am trying to raise a number of questions regarding the demand for smaller states and its justification along with a brief suggestion.

Key Words: Smaller State, Changing India, State Reorganization, Union of States, Identity, Regionalism.

ভূমিকা: বর্তমান সময়ে ছোট রাজ্যের দাবী ভারতীয় রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের একটি অন্যতম চর্চিত ও বিতর্কিত বিষয়। বাস্তব প্রয়োজনে বৈচিত্রময়, এতবড় ভূখণ্ডভিত্তিক ভারতবর্ষে একটি নতুন রাষ্ট্রের গঠন হতেই পারে। কিন্তু বিষয়টি যখন জাতি গঠনের সমস্যা বনাম জাতীয়তাবাদ, জাতীয় স্বার্থ বনাম আঞ্চলিকতাবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, জাতীয় সংহতি বনাম আত্মপরিচিতি রক্ষা, অসম উন্নয়ন ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশের সুযোগ বনাম নির্দিষ্ট শ্রেণি স্বার্থরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় তখন তা আর সাধারণ বিষয় হিসাবে থাকে না।

উদ্দেশ্যসমূহ: বর্তমান প্রবন্ধে মূলত দুটি বিষয় অনুসন্ধানের প্রয়াস থাকবে- (১) স্বাধীনতার ৬৮ (২০১৫) বছর পরেও ছোট রাজ্যের দাবী কেন? এবং (২) এই দাবীর প্রাসঙ্গিকতাই বা কতখানি।

গবেষণা পদ্ধতি: প্রবন্ধটিতে মূলত মাধ্যমিক স্তরের (Secondary Source) তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং বর্ণনামূলক পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বাধীনতার সংকট: ছোট রাজ্যের দাবীর প্রাসঙ্গিকতা অনুধাবনে স্বাধীনতাকালীন ও স্বাধীনোত্তোর ভারত রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অভিমুখ অনুধাবনের প্রয়োজন আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সাধারণ ভারতীয়দের জন্য নিয়ে এসেছিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম মুদ্রাস্ফীতি, বিশৃঙ্খলা আর দুর্ভিক্ষ। যদিও, এই সময়কালে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণির অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। এই শক্তি অনেক ক্ষেত্রে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে জিনিসপত্রের বর্ধিত চাহিদার সুযোগ নিয়ে অন্যায় পথে এসেছিল। এই পর্যায়ে নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক গোষ্ঠীরও ছিল গভীর অভিজ্ঞতা ও যথেষ্ট উৎকর্ষসম্পন্ন রাজনৈতিক ও কৌশলগত দক্ষতা। অপরদিকে, ভারতীয় সমাজের নিম্নবর্তী স্তরগুলো সাংস্কৃতিক দিক থেকে পশ্চাদপদ,

সাংগঠনিকভাবে দুর্বল ও রাজনৈতিক দিক থেকে পুঁজিপতি বা বুর্জোয়া শ্রেণির তুলনায় কম চেতনাবিশিষ্ট। তাছাড়া, এঁদের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা ও অভিজ্ঞতাও তুলনামূলকভাবে কম ছিল। ফলে, এটা খুব স্বাভাবিক যে, স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে পুঁজিপতি শ্রেণিরই আধিপত্য থাকবে আর তা এই শ্রেণির স্বার্থের অনুকূল হবে।পরবর্তী সময়ে দেখাও গেছে যে, ভারত রাষ্ট্রের ইতিহাস নির্মিত হয়েছে নিয়মতান্ত্রিকতা, তীব্রতর সাম্প্রদায়িকতা, ক্রমবর্ধমান আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও কায়েমী স্বার্থপরায়ণ গোষ্ঠীভুক্ত নেতৃবৃন্দ কর্তৃক গণ আন্দোলনগুলোর বিরোধিতা কিংবা বিকৃতির মধ্য দিয়ে।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান রূপকার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বুর্জোয়াশ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে। ব্রিটেনের চরম সংকটকালীন অবস্থায় সবচেয়ে বড় সুবিধা আদায়ের জন্য গণ আন্দোলনের চাপ ও তার ভীতিকে পিছনে রেখে কংগ্রেস আলাপ-আলোচনা ও দর কষাকষির প্রধান কৌশলকে আরো দৃঢ়ভাবে বাস্তবায়িত করেছিল। এই কৌশলের নীতি ছিল দেশের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী অসন্তোষকে একটা গণ আন্দোলনে রূপান্তর ঘটানো যা অবশ্যই বৈপ্লবিক স্তরে যাবে না অথচ বেশ বড় আকারের সুবিধা আদায় ও ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির হাতে ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করার ব্যাপারে চাপ বজায় রাখতে পারবে।পুঁজিপতি শ্রেণি এটা বুঝেছিল যে, একটা **বৈপ্লবিক গণ আন্দোলন** শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসানই ঘটাবে না, সেই সাথে ভারতীয় ভূ-সম্পত্তির অধিকারী শ্রেণিগুলিরও বিলুপ্তি ঘটাবে।কংগ্রেসের অন্তর্নিহিত এই দুর্বলতার কথা মুসলিম সামন্ততান্ত্রিক-ধনতান্ত্রিক শ্রেণিগুলির দল মুসলীম লীগ জানতো বলে তাঁরা স্বাধীন পাকিস্থান রাষ্ট্রের সৃষ্টিকে তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য বলে ঘোষণা করে।কংগ্রেসের সঙ্গে দরকষাকষি করে, সাম্প্রদায়িক গোলমালের ভয় দেখিয়ে বা সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাটোয়ারা নীতির উল্লেখ করে মুসলীম লীগ তাঁদের দাবী আদায়ের পথকে আরো সুগম করে তোলার চেষ্টা করে।অপরদিকে, যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে নাৎসী জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করলে আর ব্রিটেনসহ অন্যান্য গণতান্ত্রীক সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হলে কম্যুনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য সকল প্রকার সংগ্রামের বিরোধিতা করলো। যা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী মুক্তি সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রইল। মোট কথা হল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উদ্ভুত পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, জাতীয় কংগ্রেস, মুসলীম লীগসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি সবচেয়ে বেশি সুবিধা লাভের নিজ নিজ পরিকল্পনা গ্রহণ করে।[১]

স্বাধীনোত্তোর ভারতবর্ষে সম্পত্তির অধিকারকে নিশ্চয়তা দিয়ে তবেই ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর গণপরিষদে সংবিধান গৃহীত হয়েছে। যা প্রকারান্তরে ভারত রাষ্ট্রকে বুর্জোয়া রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। উল্লেখ্য, H. J. Laski তাঁর *The State in Theory and Practice* (1935) গ্রন্থে বলেছেন যে, যে সমস্ত রাষ্ট্রে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে বাস্তবে সেখানে পক্ষপাতিত্বপূর্ণ ভার থাকবেই।[২] মার্কসও অনেকটা একইরকম ভাবে রাষ্ট্রকে শ্রেণি শোষণের যন্ত্র হিসাবে প্রতিপন্ন করেছেন।বস্তুত, স্বাধীনোত্তোর ভারতবর্ষের রূপান্তর আনা হচ্ছে মূলত ধনতান্ত্রিক পথ ধরে। স্বাধীনোত্তোর ভারতীয় রাষ্ট্র হল একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। বিভিন্ন সরকারের (কেন্দ্র ও রাজ্যে) গৃহীত নীতির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও সবক্ষেত্রেই পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক পথের স্পষ্ট আভাষ রয়েছে। যে আভাষ অসাম্যের বাইনারিগুলিকে জিইয়ে রাখতে সাহায্য করেছে। যা পরোক্ষে এক শ্রেণির ভারতীয়দের দ্বারা আর এক শ্রেণির ভারতীয়দের শোষণ ও নির্যাতনের পথকে প্রশস্ত করেছে। সামগ্রিক ভাবে এই সমস্ত বিষয়গুলি ভারতীয় জাতীয়তাবাদকেই প্রশ্নের সামনে ঠেলে দিয়েছে তেমনি, পৃথক ছোট রাজ্যের দাবী ও তার গঠন প্রক্রিয়াকেও একটি চলমান সমস্যা হিসাবে প্রতিপন্ন করে তুলেছে।

স্বাধীনোত্তোর ভারতবর্ষে রাজ্য গঠন ও পুনর্গঠন: ভারতীয় সংবিধানের ১ (১) নং ধারায় ভারতকে 'রাজ্যসমূহের একটি ইউনিয়ন' (a Union of States) বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[৩] সংবিধানের কোথাও ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র বলে উল্লেখ করা হয়নি। গণপরিষদে অনুষ্ঠিত বিতর্কের সময় ড. বি. আর. আম্বেদকর ভারতবর্ষকে 'রাজ্যসমূহের একটি ইউনিয়ন' বলার পেছনে দুটি কারণের উল্লেখ করেছিলেন, যথা-১) বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের মধ্যে চুক্তির ফলে ভারত রাষ্ট্র গঠিত হয়নি এবং ২) ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোন অধিকার অঙ্গরাজ্যগুলির নেই। যদিও একথা অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই যে গঠনগত দিক থেকে ভারতের শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয়প্রতিম। প্রথম তপশিলে বর্ণিত সংবিধানের ১ (২) নং ধারা অনুসারে রাজ্যসমূহ এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে নিয়ে ভারতের ভূখণ্ড গঠিত হবে। ১৯৫০ সালের ২৬ শে জানুয়ারি সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার সময় ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তভূক্ত ভূখন্ডকে 'ক', 'খ', 'গ' এবং 'ঘ'- এই চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা

হয়েছিল। ৯টি (মাদ্রাজ, বোম্বাই, পাঞ্জাব, বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, আসাম) ব্রিটিশ গভর্নর শাসিত প্রদেশকে 'ক', ৮টি (রাজস্থান, মহীশূর, জম্মু ও কাশ্মীর, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, মধ্য ভারত, পাতিয়ালা ও পূর্ব পাঞ্জাব রাজ্য ইউনিয়ন, সৌরাষ্ট্র, হায়দ্রাবাদ) দেশীয় রাজ্য (Princely States) -কে 'খ', ১০টি (আজমীর, ভূপাল, কুর্গ, কচ্ছ, বিন্ধ্যপ্রদেশ, দিল্লি, মণিপুর, ত্রিপুরা, হিমাচলপ্রদেশ) পূর্বতন প্রধান কমিশনার শাসিত প্রদেশ ও প্রধান কমিশনার শাসিত প্রদেশের মর্যাদাযুক্ত দেশীয় কেন্দ্রশাসিত রাজ্যগুলিকে 'গ' এবং 'ঘ' শ্রেণিভুক্ত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে কেন্দ্রের প্রশাসনিক অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৫৩ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ নামক নতুন রাজ্য সৃষ্টি হয় এবং তা 'ক' শ্রেণিভুক্ত হয়। ফলে, 'ক' শ্রেণিভুক্ত রাজ্যের সংখ্যা বেড়ে হয় ১০।[৪]

১৯৫০ সালের এই শ্রেণি বিভাজন ছিল মূলত একটি অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা। বৈচিত্রময় ভারতবর্ষের অস্তিত্ব যাতে কোন ভাবে বিপন্ন হয়ে না পড়ে সেজন্য ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের লক্ষ্যে সংবিধানের ২-৪ নং ধারাগুলিতে রাজ্য গঠন ও রাজ্য পুনর্গঠন প্রভৃতি বিষয়ের সংস্থান রাখা হয়েছে। **রাজ্যগঠন** বলতে বিদ্যমান এক বা একাধিক রাজ্যের অংশকে নিয়ে একটি নতুন রাজ্য সৃষ্টি করাকে বোঝায়। আর **রাজ্য পুনর্গঠন** বলতে বিদ্যমান এক বা একাধিক অঙ্গরাজ্যের ভূখণ্ডগত পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস সাধনকে বোঝায়।এই হিসাবে, একাধিক রাজ্যের সংযুক্তিকরণ, একটি রাজ্যকে বিভক্ত করে একাধিক রাজ্যে পরিণত করা কিংবা কোন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বা তার একটি অংশ নিয়ে নতুন রাজ্য গঠন করা হলে তাকে রাজ্য পুনর্গঠন হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। সংবিধানের ৩ নং ধারা অনুসারে রাজ্য গঠন ও পুনর্গঠনের ক্ষমতা পার্লামেন্টের হাতে অর্পিত হয়েছে। এই ধারা অনুসারে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়নের মাধ্যমে যে কোন অঙ্গরাজ্যের কোন অঞ্চলকে পৃথক করে, দুই বা ততোধিক অঙ্গরাজ্য বা তাদের অংশকে সংযুক্ত করে অথবা কোন একটি অঞ্চলকে অন্য একটি অঙ্গরাজ্যের অংশের সঙ্গে সংযুক্ত করে- (১) নতুন রাজ্য গঠন করতে, (২) যে কোন অঙ্গরাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করতে, (৩) যে কোন অঙ্গরাজ্যের আয়তন হ্রাস করতে, (৪) যে কোন অঙ্গরাজ্যের সীমানা পরিবর্তন করতে এবং (৫) যে কোন অঙ্গরাজ্যের নাম পরিবর্তন করতে পারে।[৫] তবে রাজ্য গঠন ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত বিল রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়া পার্লামেন্টে উত্থাপন করা যায় না। আবার এই ধরণের বিল পার্লামেন্টে উত্থাপনের পূর্বে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মতামত গ্রহণের জন্য বিলটিকে রাজ্য আইনসভার কাছে প্রেরণ করতে পারেন। রাষ্ট্রপতি নির্ধারিত একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে ওই বিষয়ে মতামত জ্ঞাপন করতে হয়। তবে রাজ্য সরকারের মতামত গ্রহণ করতে রাষ্ট্রপতি বাধ্য নন। ব্যতিক্রম হল, সংবিধানের ৩৭০ নং ধারা অনুসারে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের নাম, আয়তন ও সীমানা পরিবর্তনের জন্য ওই রাজ্যের সম্মতি অবশ্যই গ্রহণ করতে হয়।

সংবিধান রচনাকালে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের জন্য ভারতের বিভিন্ন অংশে বিশেষত দক্ষিণ ভারতে জোরদার দাবি উঠেছিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের যৌক্তিকতা বিচার বিবেচনার জন্য গণপরিষদের সভাপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ ১৯৪৮ সালের ১৭ই জুন এলাহবাদ হাইকোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি এস. কে. দারের সভাপতিত্বে 'ভাষাভিত্তিক প্রদেশ কমিশন' (Linguistic Provinces Commission) নিয়োগ করেছিলেন। ওই কমিশন **'দার কমিশন'** নামে পরিচিত। ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর দার কমিশন সরকারের কাছে যে রিপোর্ট পেশ করে তাতে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের পরিবর্তে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য রাজ্য পুনর্গঠনের সুপারিশ করা হয়। কমিশন আরো বলে যে, মূলত ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠন করা হলে তা ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী হবে। কিন্তু দার কমিশনের সুপারিশের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শিত হলে ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের জয়পুর অধিবেশনে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন বিষটি পুনর্বিবেচনার জন্য জওহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও পট্টভি সীতারামায়াকে নিয়ে একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ওই কমিটি **জে. ভি. পি. কমিটি** নামে পরিচিত। ১৯৪৯ সালের ১লা এপ্রিল প্রকাশিত কমিটির রিপোর্টে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন সম্ভাবনাকে বাতিল করে দেয়। তবে, রিপোর্টে একথাও বলা হয় যে, জনসাধারণের একটি বড় অংশ চাইলে সীমিতভাবে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। রিপোর্টের এই অংশটিকে কাজে লাগিয়ে তেলেগু ভাষাভাষী লোকেরা পৃথক রাজ্যের দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয়ে মাদ্রাজের তেলেগু ভাষাভাষী উত্তর অংশকে নিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ নামে একটি নতুন রাজ্য গঠন করে। উল্লেখ্য, স্বাধীন ভারতবর্ষে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের সূত্রপাত ঘটে এখান থেকেই।

অন্ধ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠার দাবি কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নেওয়ার পর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবি ব্যাপক আকার ধারণ করতে থাকে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৩ সালের ২২শে ডিসেম্বর **'State**

Reorganisation Commission' গঠন করে। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন সুপ্রিমকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ফজল আলি এবং অপর দুই সদস্য ছিলেন কে. এম. পানিক্কর ও হৃদয়নাথ কুঞ্জরু। ১৯৫৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করে। প্রদত্ত রিপোর্টে 'ক', 'খ', 'গ' ও 'ঘ' শ্রেণিভুক্ত রাজ্যগুলির বিলোপসাধন করে সমগ্র দেশকে ১৬টি রাজ্যে এবং ৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিভক্ত করার সুপারিশ করা হয়। ১৬টি রাজ্য হল-অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, বিহার, বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ, জম্মু-কাশ্মীর, কর্ণাটক, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, বিদর্ভ এবং পশ্চিমবঙ্গ। ৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হল- দিল্লি, মণিপুর এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। কেন্দ্রীয় সরকার এই কমিশনের সুপারিশ সংশোধনীসহ গ্রহণ করে **১৯৫৬ সালে 'State Reorganisation Act'** প্রণয়ন করে। এই আইনের মাধ্যমে ১৪টি রাজ্য ও ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠিত হয়। ১৪টি রাজ্য হল-অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, বিহার, বোম্বাই, জম্মু-কাশ্মীর, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, মাইসোর, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ। ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হল- দিল্লি; হিমাচল প্রদেশ; মণিপুর; ত্রিপুরা; আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদিভি দ্বীপপুঞ্জ।[৬]

১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠন আইনের মাধ্যমে অধিকাংশ ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠিত হলেও সমস্যা মিটল না। পরবর্তী সময়ে নতুন রাজ্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক আন্দোলন পরিলক্ষিত হয়েছে এবং নতুন রাজ্য গঠিতও হয়েছে। ২০১৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে রাজ্য পুনর্গঠিত হয়েছে যার পরিণতিতে আজ রাজ্যের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৯ এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দাঁড়িয়েছে ৭। **২৯টি অঙ্গরাজ্য হল-** ১. উত্তর প্রদেশ (২২মার্চ ১৯০২, সংযুক্ত প্রদেশ হিসাবে), ২. আসাম (১লা এপ্রিল, ১৯১২, আসাম প্রদেশ হিসাবে), ৩. উড়িষ্যা (১লা এপ্রিল, ১৯১২, উড়িষ্যা প্রদেশ হিসাবে), ৪. বিহার (১লা এপ্রিল, ১৯৩৬), ৫. পাঞ্জাব (১৫ অগস্ট, ১৯৪৭, পূর্ব পঞ্জাব হিসাবে), ৬. পশ্চিমবঙ্গ (১৫ অগস্ট, ১৯৪৭), ৭. মধ্যপ্রদেশ (১৫ অগস্ট, ১৯৪৭), ৮. জম্মু-কাশ্মীর (২৬ অক্টোবর, ১৯৪৭), ৯. রাজস্থান (২৬ জানুয়ারি, ১৯৫০), ১০. তামিলনাড়ু (২৬ জানুয়ারি, ১৯৫০, মাদ্রাজ হিসাবে), ১১. অন্ধ্রপ্রদেশ (১লা অক্টোবর, ১৯৫৩, অন্ধ্র স্টেট হিসাবে), ১২. কেরালা (১লা নভেম্বর, ১৯৫৬), ১৩. কর্ণাটক (১লা নভেম্বর, ১৯৫৬), ১৪. মহারাষ্ট্র (১লা মে, ১৯৬০), ১৫. গুজরাট (১লা মে, ১৯৬০), ১৬. নাগাল্যান্ড (১লা ডিসেম্বর, ১৯৬৩), ১৭. হরিয়ানা (১লা নভেম্বর, ১৯৬৬), ১৮. হিমাচল প্রদেশ (২৫ জানুয়ারি, ১৯৭১), ১৯. মণিপুর (২১ জানুয়ারি, ১৯৭২), ২০. ত্রিপুরা (২১ জানুয়ারি, ১৯৭২), ২১. মেঘালয় (২১ জানুয়ারি, ১৯৭২), ২২. সিকিম (১৬ মে, ১৯৭৫) ২৩. মিজোরাম (২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭), ২৪. অরুনাচল প্রদেশ (২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭), ২৫. গোয়া (৩০মে, ১৯৮৭), ২৬. ছত্রিশগড় (১লা জানুয়ারি, ২০০০, মধ্যপ্রদেশ ভেঙে), ২৭. উত্তরাঞ্চল বর্তমানে উত্তরাখন্ড (৯ নভেম্বর, ২০০০, উত্তরপ্রদেশ ভেঙে), ২৮. ঝাড়খন্ড (১৫ নভেম্বর, ২০০০, বিহার ভেঙে) এবং ২৯. তেলেঙ্গানা (২রা জুন, ২০১৪, অন্ধ্রপ্রদেশ ভেঙে) । **আর ৭টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হল-** ১. আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (১লা নভেম্বর, ১৯৫৬), ২. লাক্ষাদ্বীপ (১লা নভেম্বর, ১৯৫৬), ৩. দাদরা-নগর হাভেলি (১১ অগস্ট, ১৯৬১), ৪. পদুচেরি (৭ জানুয়ারি ১৯৬৩), ৫. চন্ডীগড় (১লা নভেম্বর, ১৯৬৬), ৬. দমন ও দিউ (৩০ মে, ১৯৮৭) এবং ৭. দিল্লি (১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, জাতীয় রাজধানী অঞ্চল) ।[৭]

জাতি গঠন ও জাতীয়তাবাদ: ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস ও স্বাধীনোত্তোর ভারতবর্ষের রাজ্য গঠন ও রাজ্য পুনর্গঠন প্রক্রিয়া ভারতীয় জাতি গঠন (Nation Building) ও জাতীয়তাবাদের সঙ্গে গভীর ভাবে সম্পর্কযুক্ত। সাধারণ ভাবে **জাতি** বলতে এমন একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় জনসমাজের কথা বলা হয় যারা একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপায়ণ করে বা রূপায়ণের জন্য স্বচেষ্ট হয়। ঐক্যবদ্ধ জাতীয় জনসমাজ মূলত বাহ্যিক ও ভাবগত উপাদানের দ্বারা গঠিত। বাহ্যিক উপাদানগুলির মধ্যে ভৌগোলিক ঐক্য, বংশ, ভাষা, রাজনৈতিক সংগঠন ও অর্থনৈতিক সমস্বার্থ এবং ভাবগত উপাদানের মধ্যে রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ও ঐতিহাসিক ঐক্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'আত্মশক্তি' প্রবন্ধে 'নেশন কী' নামক অংশে লিখেছেন, 'নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ।... অতীতে সকলে মিলিয়া ত্যাগদুঃখ-স্বীকার এবং পুর্নবার সেইজন্য সকলে মিলিয়া প্রস্তুত থাকিবার ভাব হইতে জনসাধারণকে যে একটি একীভূত নিবিড় অভিব্যক্তি দান করে তাহাই নেশন। ইহার পশ্চাতে একটি অতীত আছে বটে, কিন্তু তাহার প্রত্যক্ষগম্য লক্ষণটি বর্তমানে পাওয়া যায়। তাহা আর কিছু নহে- সাধারণ সম্মতি, সকলে মিলিয়া একত্রে এক জীবন বহন করিবার সুস্পষ্টপরিব্যক্ত ইচ্ছা।'[৮]

অপরদিকে, **জাতীয়তাবাদ** হল একটা আদর্শকেন্দ্রিক ভাবগত অনুভূতি; যে অনুভূতি জাতির সঙ্গে ব্যক্তির সংযোগ (attachment) -কে সুনিশ্চিত করে। বংশ, ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি যে কোন এক বা একাধিক কারণে যখন কোন একটি জনসমাজের মধ্যে গভীর একাত্মবোধ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই একাত্মবোধের জন্য ওই জনসমাজের প্রত্যেকে সুখ-দুঃখ, ন্যায়-অন্যায় ও মান-অপমানের সমান অংশীদার বলে নিজেদেরকে মনে করে, তখন তাঁদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সঙ্গে দেশপ্রেম মিলিত হয়ে একটি রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে গড়ে উঠলে তাকে জাতীয়তাবাদ বলে। এ. আর. দেশাইও জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, 'জাতীয়তাবাদ হচ্ছে একটা জাতি গঠনকারী বিভিন্ন শ্রেণি ও গোষ্ঠীর আন্দোলন যার উদ্দেশ্য হল তাদের আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতায় সব রকমের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধার অপসারণ। একই সাথে এটা সমস্ত শ্রেণি ও গোষ্ঠীর এমন একটা আন্দোলন যা তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার ইতিবাচক সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সারবস্তু মেশাতে চায়।'[৯] সুতরাং, জাতীয় জনসমাজ জাতিতে পরিণত হলে জাতীয়তাবাদ যে রূপ পরিগ্রহ করে, তাকে জাতির রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা বলে অভিহিত করা যায়। নিজেদের আত্মপরিচিতি (identity) রক্ষার্থে স্বাজাত্যবোধ বৃদ্ধি পেলে প্রতিটি জাতি নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি তোলে। এরূপ দাবি বাস্তবে রূপায়িত হলে **জাতি রাষ্ট্র** (Nation State) প্রতিষ্ঠিত হয়।

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের মতো ভারতবর্ষও দীর্ঘদিন উপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) -এর পরে। স্বাধীনতার সময় থেকে আজ পর্যন্ত ভারত রাষ্ট্রের কাছে সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ হল একটি সর্বাত্মক জাতি গঠন (Nation-building)। কেননা, স্বাধীনতা নামক জাতীয় সমস্বার্থের অনুভূতি বহুধাবিভক্ত ভারতবর্ষের মানুষকে অনেকাংশে একসূত্রে গ্রথিত করলেও সমস্যার সূত্রপাত বড় আকার ধারণ করে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে।[১০] জাতি গঠন যেখানে ঐক্যের অনুভূতি হৃদয়ে লালন করা বা নিবিড় গোষ্ঠী হিসাবে আত্মপ্রকাশের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া সেখানে ভারতবর্ষ স্বাধীনই হয়েছে ভৌগোলিক খন্ডীকরণের মধ্য দিয়ে। স্বাধীনতার ছয় বছরের মধ্যেই ভাষাভিত্তিক রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশের (১৯৫৩) আবির্ভাব। যদিও ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ভারতবর্ষের মোট মুখ্য ভাষার সংখ্যা-১২২ এবং অন্যান্য ভাষার সংখ্যা-১৫৯৯। ভারতের অফিসিয়াল ভাষার সংখ্যা-২৪।[১১] অধিকাংশ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে একাধিক ভাষাভাষি মানুষের বাস। ধর্মনিরপেক্ষতা জাতি রাষ্ট্রের অন্যতম স্তম্ভ হলেও বহুধর্মভত্তিক ভারতীয় সমাজে ধর্মীয় ভেদাভেদও সমস্যার অন্যতম কেন্দ্র।[১২] ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্ম (২০১১-৭৮. ৩৫%) প্রধান হলেও ইসলাম (২০১১-১৪. ৮৮%) -সহ খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মের বহু মানুষ এদেশে বসবাস করেন। উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া গণতন্ত্র, একাধিক উপজাতিগত বঞ্চনা, অর্থনৈতিক দিক থেকে শ্রেণিগত বৈষম্য এবং সাধারণ মানুষের ওপর অর্থনৈতিক এলিটদের নিরবিচ্ছিন্ন শোষণেরও উল্লেখ প্রয়োজন। কেননা, ভারতে পুঁজিপতিদের হাতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল। ফলে, এ দেশের জাতীয়তাবাদ স্বাধীনোত্তোর ভারতবর্ষে পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার মতাদর্শ হিসাবে কাজ করেছে। যা পরবর্তী সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে এক চলমান সমস্যা হিসাবে আঞ্চলিকতাবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

আঞ্চলিকতাবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও ছোট রাজ্যের দাবী: বর্তমানে ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের অস্থিরতার অন্যতম কারণ হল আঞ্চলিকতাবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদ। আঞ্চলিকতাবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদ বিষয় দুটির একদিকে থাকে পরিচিতিজনিত সংকট (Identity Crisis) এবং অন্যদিকে থাকে জাতীয় সংহতিজনিত সংকট (National Integrity Crisis)। **আঞ্চলিকতাবাদ** হল উপ-ভূখণ্ডগত আনুগত্যের একটি বিশেষ ধরণ। যা বিশেষ ভাবে পরিণতি লাভ করে ভৌগোলিক অবস্থান, ভাষাগত দূরত্ব, অর্থনৈতিক স্বার্থ, মনস্তাত্ত্বিক বা মতাদর্শগত পার্থক্য, নৃকুলগত ও সাংস্কৃতিক পরিচিতিজনিত বিভেদনার কারণে। এর সঙ্গে ১৯৬৭ সালের পর থেকে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের অন্যতম সমর্থক কংগ্রেস দলের রাজনৈতিক একাধিপত্য হ্রাস পেতে শুরু করার সাথে সাথে বিভিন্ন আঞ্চলিক দলের উদ্ভব ও তাদের কার্যকলাপ, ভূমিপুত্র নীতি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সীমানাগত সমস্যা, নদীর জলবন্টন সমস্যা প্রভৃতি বিষয়গুলিও কমবেশি যুক্ত। অপরদিকে, ভারতে মূলত দু'ধরণের **বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন** দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমটি হল ভারতের মধ্যে পৃথক রাজ্য গঠনের দাবি এবং দ্বিতীয়টি হল, ভারতবর্ষ থেকে বেরিয়ে গিয়ে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবি। সাধারণত দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি থেকেই পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবিগুলি উঠে থাকে। যেমন-সার্বভৌম খালিস্তান (পাঞ্জাবে), স্বাধীন অসম, পৃথক

নাগাল্যান্ড প্রভৃতির দাবি এই গোত্রের। আর যে সব অঞ্চলের চারিদিকেই ভারতীয় ভূখন্ড, কোন আন্তর্জাতিক সীমানা নেই সেখানে মূলত দাবি ওঠে পৃথক রাজ্য গঠনের।

২০১৪ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ ভেঙে তেলেঙ্গানা গঠিত হওয়ার ঘটনা ভারতের অন্যান্য অংশের বিচ্ছিন্নতাকামী, স্বতন্ত্র ও ছোট রাজ্যের দাবীজনিত আন্দোলনগুলিকে আরো উস্কে দিয়েছে। যেমন-পশ্চিমবঙ্গের গোর্খাল্যান্ড ও কামতাপুরি; কর্ণাটকের কুর্গ; বিহারের মিথিলাঞ্চল; গুজরাটের সৌরাস্ট্র; মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ; আসামের বোড়োল্যান্ড; উত্তরপ্রদেশের হরিতপ্রদেশ, পূর্বাঞ্চল, বিরাজপ্রদেশ ও অযোধ্যা (Awadh) প্রদেশ; রাজস্থানের মরুপ্রদেশ; পূর্ব উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং ছত্তিশগড়ের অংশবিশেষ নিয়ে ভোজপুর; উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের অংশবিশেষ নিয়ে বুন্দেলখন্ড; আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গের অংশবিশেষ নিয়ে গ্রেটার কোচবিহার প্রভৃতি।[১৩]

বহু সংস্কৃতিভিত্তিক ভারতে জাতীয় সংহতির পক্ষে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ানো আঞ্চলিকতাবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদ ভারতের রাজনীতির বিভিন্ন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। দাবী আদায়ের জন্য বা অনেক সময় বৈদেশিক মদতে আঞ্চলিক স্বার্থ বা স্বাতন্ত্রতাকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গী কার্যকলাপও গড়ে উঠছে। তবে মনে রাখতে হবে, আঞ্চলিক একাত্মতা বা স্বাতন্ত্র্যবোধ যে সবসময় জাতীয় সংহতির পক্ষে ক্ষতিকারক বা বিপজ্জনক হবে এমন মনে করারও কোন কারণ নেই। কেননা, আঞ্চলিক উন্নয়নের মাধ্যমেও জাতীয় অগ্রগতি সম্ভব। তাছাড়া বিষয় দুটি পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে এক সঙ্গেও থাকতে পারে।

ছোট অঙ্গরাজ্যের প্রাসঙ্গিকতা: ২০১৪ সালে ২৯তম অঙ্গরাজ্যের জন্ম হল অন্ধ্রপ্রদেশকে খণ্ডিত করে। রাজ্য গঠনের এই প্রক্রিয়া যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে একদিন ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য রাজ্যে পরিণত হবে। প্রশ্ন হল, ছোট রাজ্য গঠনের আদৌ কি কোন যুক্তি আছে?

ছোট রাজ্য গঠনের **সপক্ষে** সাধারণত যে সমস্ত যুক্তিগুলি বেশি দেওয়া হয় সেগুলি হল- (১) রাজ্য ছোট হলে আঞ্চলিক বৈষম্যের অবসান ঘটবে এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বরান্বিত হবে; (২) সার্বিক উন্নয়ন ও প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, কারণ সাধারণ ধারণা হল 'small is beautiful'; (৩) শাসনকার্য পরিচালনায় জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে; (৪) স্থানীয় চাহিদা পূরণে সরকার দ্রুত, নমনীয়, কার্যকরী ও দক্ষতাসম্পন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে; (৫) ভারতের প্রতিটি অংশ থেকে সরকারে প্রায় সমান প্রতিনিধিত্বের সুযোগ তৈরি করবে যা গণতান্ত্রিক পরিবেশকে আরো বিস্তৃত করতে সাহায্য করবে। একই সঙ্গে তা জনগণের অসন্তোষ দূর করতে যেমন সাহায্য করবে তেমনি তা জাতীয় ঐক্যকেও সুদৃঢ় করবে প্রভৃতি। আর **বিপক্ষের** যুক্তিগুলি হল- (১) আঞ্চলিক এবং ভাষাগত অন্ধ আনুগত্যের কারণে যদি ছোট রাজ্যের দাবী উঠে আসে তবে তা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রের অনুশীলনকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করবে; (২) স্বাধীনোত্তোর ভারতবর্ষে উন্নয়নের পুঁজিবাদী পথ অনুসরণের ফলে যে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে তা কেবলমাত্র ছোট রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে মেটানো সম্ভব নয়; (৩) রাজ্যের আয়তন ক্ষুদ্র হলেই দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব হবে, এই ধারণা সর্বাংশে সত্য নয়। রাজ্যের আয়তন অপেক্ষা উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভরশীল ক্ষমতার প্রকৃত বিকেন্দ্রীকরণ, শাসকের শ্রেণি চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গীর উপর; (৪) উপযুক্ত কারণ ব্যতিত যদি নতুন রাজ্যের দাবী মেনে নেওয়া হতে থাকে তাহলে ভারতবর্ষ একদিন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়বে। তা কখনই কাম্য নয়। কারণ, রাজ্য গঠন কখনই লক্ষ্য হতে পারে না, তা লক্ষ্য অর্জনের উপায় মাত্র; (৫) ছোট রাজ্য গঠন অনেক সময় রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ও অর্থনৈতিক শ্রেণিস্বার্থ রক্ষা করার জন্যেও হতে পারে; (৬) ছোট রাজ্যকে অনেক সময় প্রশাসনিক ব্যয়, উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের জন্য বা আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতিতে (যেমন-নক্সাল আন্দোলন) অর্থ বা অস্ত্র-শস্ত্রের জন্য অধিক মাত্রায় কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হতে পারে বড় রাজ্যগুলির তুলনায়; (৭) অনেক সময় ছোট রাজ্যগুলিতে (যেমন-ঝাড়খন্ড) সরকার বা রাজনৈতিক স্থায়িত্বের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা পরোক্ষে রাজনৈতিক দূরবৃত্তায়নকে উৎসাহিত করছে; (৮) নয়া সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও ষড়যন্ত্রের ফলে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক সময় অস্থিরতা দেখা দিয়েছে, যার মধ্য দিয়ে ছোট রাজ্যের দাবীও উত্থাপিত হচ্ছে। ফলে, পৃথক ছোট রাজ্যই যে সব সমস্যার সমাধান তা বলার সময় এখনও আসেনি।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায় যে, ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গঠনের দাবির পিছনে যে সব মৌলিক সমস্যা বর্তমান, সেগুলির আশু সমাধান প্রয়োজন। সমস্যাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-অর্থনৈতিক শোষণ ও পশ্চাৎপদতা, বেকারত্ব, দারিদ্র্য, সামাজিক নিপীড়ন ইত্যাদি। এই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য প্রয়োজন- বিভিন্ন অঞ্চলের সুষম ও দ্রুত উন্নয়ন, সর্ব প্রকার

বৈষম্যের অবসান এবং ক্ষমতার প্রকৃত বিকেন্দ্রীকরণ। তবে, শাসক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন না হলে এগুলি কার্যকর করা সম্ভব নয়। আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কাঠামোর পুনর্গঠন, আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র প্রদান, ক্ষমতার প্রকৃত বিকেন্দ্রীকরণ, পার্বত্য অঞ্চল ও আদিবাসী অঞ্চলের উন্নতির জন্য স্বয়ংশাসিত পরিষদ গঠন; জাতিসত্তাগত সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতার হাত থেকে মুক্তিদান প্রভৃতি একান্তভাবে প্রয়োজন।

তবে, ভারতবর্ষের পৃথক রাজ্য গঠনের ধারাবাহিক ইতিহাসের দিকে নজর দিলে যে প্রশ্নগুলি উঠে আসে সেগুলি হল- (১) পৃথক ও ছোট রাজ্য গঠনের উদ্দেশ্য কি? (২) পৃথক রাজ্য গঠিত হলে কার স্বার্থ রক্ষিত হয়? (৩) পৃথক রাজ্য গঠিত হলে সমস্যার সমাধান করে নাকি নতুন সমস্যার জন্ম দেয়? (৪) পৃথক রাজ্য গঠন করলেই কি আঞ্চলিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত হবে? (৫) পৃথক রাজ্য গঠন করলেই কি আঞ্চলিক বৈষম্য দূর হবে বা আপেক্ষিক বঞ্চনা দূর হবে এবং অনুন্নত ও অবহেলিত মানুষ উপকৃত হবেন?

বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আলোচনা করলে দেখা যাবে পৃথক ছোট রাজ্য গঠন সমস্যার সমাধান না করে সমস্যাকে আরো বাড়িয়ে দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ঝাড়খন্ড রাজ্যটির কথা বলা যায়। রাজ্যটি গঠিত হবার পনেরো দিনের মধ্যে 'ঝাড়খন্ড বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন' আত্মপ্রকাশ করে। এরা বাঙালিদের স্বার্থ রক্ষায় স্বচেষ্ট। আবার মানুষের উন্নয়ন কতটা হল তা ঠিক বোঝা না গেলেও গঠিত হবার পাঁচ বছরের মধ্যে ঝাড়খন্ড তিন জন মুখ্যমন্ত্রী পেয়েছে, যারা কোনদিনই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হতে পারতেন না। তাছাড়া, বিহার ভেঙে ঝাড়খন্ডের গঠন উভয় রাজ্যের অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থাকে সমস্যায়িত করেছে। পৃথক জাতিগোষ্ঠীর জন্য পৃথক রাজ্য গঠনের কথাও বলা হয়, কিন্তু এই বক্তব্যেরও সেই অর্থে কোন অর্থ হয় না কারণ, নাহলে ঝাড়খন্ড গঠিত হবার সাথে সাথে 'ঝাড়খন্ড বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন' গঠিত হত না। আবার ভবিষ্যতে যদি কোন দিন গোর্খাল্যান্ড রাজ্য গঠিত হয় তবে সেই রাজ্যের সব মানুষ গোর্খা হবেন না। সেখানে থাকবেন লেপচা, ভুটিয়া, মেচ, রাজবংশী, বাঙালি প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীর মানুষ। যাঁরা বংশানুক্রমিক ভাবে ঐসব অঞ্চলে বসবাস করছেন এবং ঐ অঞ্চলেই জন্মেছেন। আবার যে সমস্ত গোর্খারা অন্যত্র ছড়িয়ে আছেন তাঁরা গোর্খাল্যান্ড প্রতিষ্ঠিত হলেই যে তাঁদের চাকরি, ব্যবসা, বাড়ি-ঘর ছেড়ে গোর্খাল্যান্ডে ফিরে আসবেন এমন সম্ভাবনাও কম। ফলে, সমস্যার সমাধান অধরাই থেকে যাবে। স্বশাসন বা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য অনেক সময় ছোট রাজ্য গঠনের কথা বলা হয়। কিন্তু নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম, মণিপুর প্রভৃতি ছোট রাজ্য গঠিত হলেও ঐ সমস্ত জায়গায় নাগা-মিজো সংঘর্ষ, নাগা-কুকি বিরোধ, বোড়ো-সাঁওতাল মতান্তর এড়ানো যায়নি। ফলে, বাস্তব প্রয়োজনকে মাথায় রেখে ছোট বা পৃথক রাজ্যের দাবী বিবেচনা করা প্রয়োজন। আঞ্চলিক বৈষম্য, অতিকেন্দ্রিকতার ঝোঁক, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, প্রশাসনিক সুবিধা, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগত ঐতিহ্য রক্ষা, বৈদেশিক উস্কানিমূলক কার্যকলাপ প্রভৃতি বিষয়গুলিও ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে রাখতে হবে। ভেবে দেখা যেতে পারে পুরোপুরি নতুন ভাবে রাজ্য গঠন ও পুনর্গঠনের সম্ভাবনার বিষয়টিকেও। কারণ মনে রাখতে হবে অসন্তুষ্ট অঙ্গরাজ্য, হতাশ জনগোষ্ঠী এবং বঞ্চিত জনসম্প্রদায়ই আঞ্চলিকতাবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও পৃথক ছোট রাজ্য গঠনের অন্যতম কারণ।

- **তথ্যসূত্র:**

১. দেশাই, এ. আর. (১৯৯৯). *ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সাম্প্রতিক প্রবণতা,* কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, পৃ. ৩১-৩৪।

২. Laski, H. J. (1935). *The State in Theory and Practice,* New York: The Viking Press, p. 211.

৩. *The Constitution of India.* (2009). Delhi: Professional Book Publishers, p. 2.

৪. Pylee, M. V. (2013). *India's Constitution,* New Delhi: S. Chand & Company Ltd., pp. 39-40.

৫. *The Constitution of India, op. cit.,* p. 2.

৬. Pylee, M. V., *op. cit.,* pp. 43-44.

৭. *State and Union Territories of India,* Retrieved From: https://en. wikipedia. org/wiki/States_and_union_territories_of_India [Accessed on 22 July 2015].

৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. (১৪১৭). "আত্মশক্তি", নেশন কি, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* দ্বিতীয় খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পৌষ (পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ৬১৯-২২।

৯. দেশাই, এ. আর., প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩-৬৪।

১০. Gauba, O. P. (2013). *An Introduction to Political Theory* (Sixth edition), Delhi: Macmillan Publishers India Ltd., p. 158.

১১. *Languages of India,* Retrieved From: https://en. wikipedia. org/wiki/Languages_of_ India [Accessed on 23 July 2015].

১২. Chandra, Bipan. (1999). *Essays on Indian Nationalism* (Second Edition), New Delhi: Har-anand Publications pvt Ltd, p. 84.

১৩. Kumar, Ashutosh. (August 14, 2010). "Exploring the Demand for New States", *Economic & Political Weekly,* Vol. XLV No. 33, pp. 15-16.